খণ্ড ২, সংখ্যা ২ | ভাবনগর | এপ্রিল ২০১৫
Vol. 2, No. 2 | BHABNAGAR | April 2015

কৃত্তিবাস ও মাইকেলের রামাদি চরিত্র

ক্লিন্টন বি. সীলি

রামায়ণের আখ্যান অবলম্বনে রাজা রবি ভর্মা অঙ্কিত চিত্র

Ramas in Krittibas and Madhusudan

Clinton B. Seely

Abstract

Michael Madhusudan Datta is one of the pioneer of modern Bangla poetry. *Meghnadbadh Kabya* is the best work of Madhusudan's, and all recognize it as a modern epic. However, the plot of this epic was derived from the ancient literary tradition of the *Ramayan*. Among the mentioned literary tradition, the most ancient one is Balmiki's Sanskrit *Ramayan*, which was written some 300-400 years before Christ. Then in the 15th century Krittibas wrote a *Ramayan* in Bangla. It was not in any way a faithful translation of Balmiki's *Ramayan* but rather a documentary of sorts of Krittibas' own time. When Michael Madhusudan Datta wrote 'Meghnadbadh Kabya' based on certain characters of the same plot, there are of course some distinctions. Analyzing utterances of Michael himself, especially his letters' and reading his epic intensively, these distinctions are identified in this essay. The discourse of this essay is based on characteristics of Ramas in Madhusudan and Krittibas.

কৃত্তিবাস (খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক) বাংলা ভাষায় প্রথম *রামায়ণ* রচনা করেন। আর এটি তিনি রচনা করেছিলেন বাল্মীকির সংস্কৃত *রামায়ণে*র অনুপ্রেরণায়। কিন্তু, কৃত্তিবাস তাঁর প্রায় দুই হাজার বছরের পূর্ববর্তী কবি বাল্মীকির সংস্কৃত রচনার হুবহু অনুকরণ করেননি, তার বদলে বাংলার দেশ-কাল-পাত্র ও সংস্কৃতির অপূর্ব গ্রন্থনায় নানা ধরনের মৌলিকত্ব সংযোজন করেছেন, এমনকি চরিত্র চিত্রণে তিনি বাঙালির পারিবারিক ঐতিহ্য, ভ্রাতৃত্ব, সমাজিক-মানবিক গুণাবলী আরোপ করেছেন। সে কারণে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* একই সঙ্গে বাংলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ও শহরের শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, বাঙালির আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত নতুন সাহিত্যের অভিযাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন কৃত্তিবাসের *রামায়ণে*র অনুপ্রেরণা। এবার মাইকেল ও তৎকালীন বাংলা সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), বাংলা ও ইংরেজি ভাষার একজন ব্যতিক্রমী কবি ও নাট্যকার, তাঁর সময়ে অনেকভাবে শিক্ষিত বাঙালিরা অনায়াসে পূর্ব ও পশ্চিম তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটছিল ব্রিটিশদের ইস্ট ইন্ডিয়া সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক রাজধানী কলকাতায়। মাইকেল মধুসূদন নামটি সেই মিলনের একটি দৃষ্টান্ত বহন করে; কেননা, তাঁর নামের প্রথম অংশ খ্রিষ্টান-ইউরোপিয়ান (মাইকেল) এবং দ্বিতীয় অংশ সনাতন-ভারতীয় (মধুসূদন দত্ত)। এ ধরনের নামের মাধ্যমে আমরা একদিকে মধুসূদনের পাশ্চাত্যানুসরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই, অন্যদিকে ঐতিহ্যের প্রতি গূঢ় মোহ শনাক্ত করতে পারি; একই সঙ্গে ওই নামটি দুইশত বছরের ঔপনিবেশিক সময়ের দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির চরম দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের মধ্যরাতের সংঘটিত ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বিভক্তির মধ্য দিয়ে, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান নামে বিভক্ত করে ফেলে। তার আগেই মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-এর আবির্ভাব যেমন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তেমনি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল লেখক মাইকেলের আবির্ভাবের; *মেঘনাদবধ কাব্য*টি একইসাথে অসাধারণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক মাইকেলকে অবস্থানে নিয়ে যায়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মাইকেলের *মেঘনাদবধ কাব্য* অতুলনীয় এক সাহিত্যকর্ম, নয় সর্গে বিভক্ত আভিজাত্যময় বর্ণনামূলক কাব্য; এটা সম্পূর্ণভাবেই উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষের উদার সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়া, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বিত প্রকাশের কাব্য।

দুই

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইস্কুলের বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে স্পষ্টভাবে লিখলেন, তিনি রামকে ভালো চোখে দেখতেন না, বরং রাবণের উপরে তাঁর উৎসাহ ও সম্মান অনেক বেশি : 'People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghnad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble, but the idea of Ravan elevates and kindle my imagination; he was a grand fellow.'[১] এই মনোভাব তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্যে* নানান ভাবে প্রতিফলিত হয়। কাব্যটি পড়লে পাঠকের সহানুভূতি রামের জন্য নয়, রাবণের জন্য গড়ে ওঠে। ফলে অনেকে মনে করেন যে, সুপরিচিত প্রাচীন রামায়ণের রাম-রাবণের তুলনায় মাইকেলের রাম-রাবণ নিশ্চয় অন্য ধরনের চরিত্র হয়ে গিয়েছে।

তা সত্ত্বেও অথবা সেই কারণেই হয়তো অধিকাংশ সমালোচক মাইকেলের কৃতির প্রশংসা করেছেন। তিনিই প্রকাশ্যে—নিজের ঢাক বোধহয় একটু বেশি পিটিয়ে—তা মেনে নিয়ে বললেন : 'The poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton- but that is all bosh-nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets; Milton is divine.'[২] যতই প্রশংসা হোক প্রায় সবাই বলেন, মাইকেলের রাম-রাবণ চরিত্রে মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। অবশ্যই এই মতের ব্যতিক্রমে মাইকেলের সমসাময়িক ও ভক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছিলেন : 'দত্ত কবিবর রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াই *মেঘনাদবধ কাব্য* লিখিয়াছেন।'[৩] তবে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের নতুনত্বর উল্লেখ করেছেন :

> '... Mr. Datta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But, never the less, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, character, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Datta's creations.'[৪]

রাবণকে নিয়ে মোহিতলাল মজুমদার, খুব সম্ভব বর্তমানের সমালোচকদের মতামতের স্রষ্টা, যখন লিখেছেন : 'মেঘনাদবধের রাবণ দুরাচারী দুর্মদ রাক্ষস মাত্র নহে; কবি তাহার চরিত্রকে সর্ববিধ মর্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছেন—রাজা, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, যোদ্ধা ও সরলস্বভাব ভক্ত রূপে তিনি তাহার যে মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার কোথাও নীচুতা বা কপটতা নাই।'[৫]

আজকালকার একাধিক সমালোচক মোহিতলালের কথা টেনে নিয়ে *রামায়ণের* রাবণ ও মাইকেলের রাবণের মধ্যে যে ব্যবধান, সেটার উপরে জোর দেন। নীলিমা ইব্রাহিম লেখেন : 'রাবণচরিত্র রূপায়ণে যে মধুসূদন পৌরাণিক নীতির পরিবর্তন করেছেন এ সর্বজনগ্রাহ্য সত্য, পুরাণের রাবণ রাক্ষস দশমুণ্ড, কুড়ি হাত। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ নামে রাক্ষস, ... রাবণ রাজা, রাবণ স্বামী, রাবণ পিতা, রাবণ শ্বশুর, রাবণ ভক্ত, সর্বোপরি নিষ্ঠুর নিয়তির চক্রে নিষ্পেষিত অসহায় মানব সন্তান।'[৬] সুরেশচন্দ্র মৈত্র এইভাবে রাবণকে বর্ণনা করেন :

'মধুর নায়ক সর্ববিধ সুস্থতার প্রতীক- সে দক্ষ সেনানী, প্রেমময় স্বামী, স্নেহকাতর পিতা, জনপ্রিয় শাসক, এবং সুতনু নর।'৭ মোবাশ্বের আলী, বোধহয়, মোহিতলালের কথা সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে দেন যেখানে লেখেন : 'যুগগত প্রয়োজনে কবি এ চরিত্রকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং এ চরিত্রে মানবতাবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ... রাবণ তার কাব্যে রাক্ষস হলেও মহৎ গুণে মণ্ডিত। ... সে কর্তব্যপরায়ণ সম্রাট, প্রজাবৎসল রাজা, সন্তানবৎসল পিতা, স্নেহবৎসল ভ্রাতা এবং অনুরাগী স্বামী।'৮

এই হলো *মেঘনাদবধ কাব্যের* প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের তালিকা। তথাকথিত পরিবর্তিত চরিত্রের উৎস ও মাইকেলের প্রেরণা বার করতে গেলে সমালোচকেরা সাধারণত পাশ্চাত্য সাহিত্যে খুঁজতে যান। কয়েকজন দক্ষিণ ভারতেও তাকিয়ে দেখেন, বিশেষত তামিল ভাষায় রচিত *কম্ব-রামায়ণের* প্রভাবের জন্য।৯ মাইকেলের হাতে কোনো না কোনো ভাবে এবং কোনো না কোনো কারণে রাম-রাবণ চরিত্র রূপান্তরিত হয়েছে, সেই ধারণা খুব ব্যাপকভাবে রটে গেছে। মাইকেলের নিজস্ব ঐতিহ্যের *রামায়ণের* দিকে সমালোচকেরা তুলনা করার জন্য যে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না—তা নয়, তবে যতটা করা উচিত—হয়তো ততটা করা হয়নি।

এখানে আমি আমার বক্তব্য বলে রাখি। কৃত্তিবাসের রাম-রাবণের তুলনায় যে *মেঘনাদবধ কাব্যে* চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে, আমার মতে তা আসলে সঠিক নয়। মূলত রাম-রাবণের যে রকম স্বভাব ও স্বধর্ম *রামায়ণে* দেখা যায় বিশেষ করে বাংলাভাষার সবচেয়ে বিখ্যাত কৃত্তিবাস-প্রণীত *রামায়ণে*, তা থেকে *মেঘনাদবধ কাব্যের* চরিত্র-বিচ্যুতি নেই। পাঠক কৃত্তিবাসের চরিত্রগণের তুলনায়

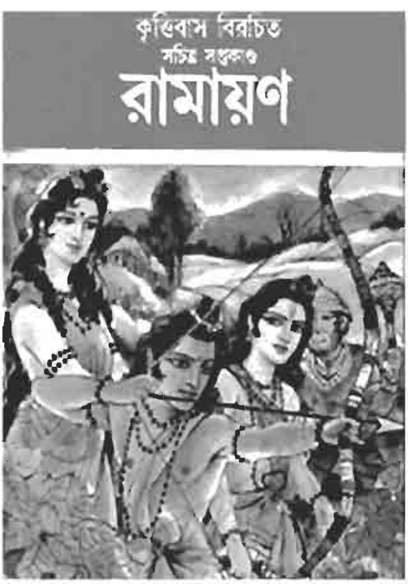

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচ্ছদ চিত্র

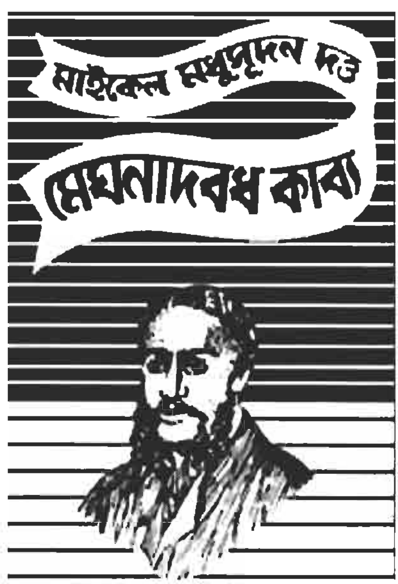

মাইকেল মধুসুধন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রচ্ছদ

মাইকেলের রামাদিকে অন্য চোখে দেখেন, তবে সেটা আলাদা একটা ব্যাপার। মূল চরিত্রের রূপ ও রেখা রূপান্তরিত হয়নি।

চরিত্রগুলি এখন পরীক্ষা করে দেখি। মাইকেলের রাবণ কর্তব্যপরায়ণ সম্রাট আর প্রজাবৎসল রাজা কিনা, সেই বিষয় আমার ছাড়াও চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁর একজন স্ত্রীর এবং তাঁর ইষ্টদেবতা মহাদেব শিবের সংশয় থাকতে পারে; কেননা, দ্বিধা না করে এ দুজন সোনার লঙ্কার দুর্দশার জন্য রাবণকে দায়ী মনে করেন। চিত্রাঙ্গদা দুঃখে ও রাগে বলেন: 'হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে/মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি' (১:৪০৪:৪০৫)। শিবও মনে করেন : 'পরম ভকত মম নিকষানন্দন; কিন্তু নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।/বিদরে হৃদয় মন স্মরিলে সে কথা,/মহেশ্বরি হায়;। দেবি, দেবে কি মানবে,/ কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?' (২:৪২৯-৪৩৩) নির্দোষী, আদর্শ রাজেন্দ্র যদি নাই-বা হয়ে থাকেন তো রাক্ষসগণের অধিপতি রাবণ মাইকেলের হাতে 'সন্তানবৎসল পিতা', তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম সর্গে আমরা একজন স্নেহশীল পিতাকে দেখতে পাই। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর এত দুঃখ লাগে যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মাইকেল বলেন :

> এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি
> বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
> অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
> যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
> বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি
> দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত,... (১:৬২-৬৭)

আর

> এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
> হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
> নৈকষেয়। সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
> আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
> দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
> বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ;— (১:৭৪-৯)

তারপর শোক আপশোস মিলে সুন্দর একটা ভাষণ রাবণের মুখ দিয়ে প্রকাশ করার পরে মাইকেল বলেন :

> এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস
> কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
> হস্তিনায় অন্ধ রাজ, সঞ্জয়ের মুখে
> শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
> হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে। (১:১১৪-১১৮)

কৃত্তিবাসের রাবণ পুত্রদের প্রতি কি রকম স্নেহ ও মমতা দেখান, তা নিয়ে মাইকেলের রাবণের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক, কত ব্যবধান রয়েছে বা আদৌ ব্যবধান আছে কিনা।

বীরবাহু মারা গেলে কৃত্তিবাস বলেন :

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।[১০]

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* বীরবাহুর পরাজয়ের পরে রাবণের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদের তৃতীয়বার যুদ্ধযাত্রা ও সেইবার তাঁর পরাজয়। তবে বীরবাহুর আগে আরো অনেক পুত্র মারা গিয়েছিল। তাদেরও মৃত্যুর উপলক্ষে কৃত্তিবাসের রাবণ রাক্ষস সত্ত্বেও মনুষ্যের মতো—এমন কি মাইকেলের রাবণের মতোই—শোক প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন।

রাক্ষস পুত্রদের মধ্যে মকরাক্ষ নামে একজন, যার মৃত্যুর পরে কৃত্তিবাস বলেন :

ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর।
মকরাক্ষ পড়ে রণে শুন লঙ্কেশ্বর।
শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত।
সিংহাসন হতে পড়ে হইয়া মূর্ছিত ॥
পাত্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর।
ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর ॥ (পৃ. ৪২৭)

অতিকায় নামে রাবণের আরেকজন পুত্র। কৃত্তিবাস বলেন :

তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদগদ ভাষে ॥
মহারাজ চারিজন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল দুইজন ভ্রাতা আর ॥
তার মধ্যে পঞ্চ জনে বানরে বধিল।
অতিকায় লক্ষণের বাণেতে মরিল ॥
দূত মুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে রহে দশানন।
মুহূর্তেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন।
কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ॥
পূর্ণবার দূত কৈল সব নিবেদন।
তাহা শুনি মূর্ছিত হইল দশানন ॥
কিছুকাল পরে পুনঃ সম্বিত পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া ॥
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন।
না পারয়ে করিবারে ধৈরয ধারণ ॥
বিংশতি নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়।
মুক্তকণ্ঠে হয়ে রাজা ক্রন্দন করয় ॥ (পৃ. ৪০২)

শুধু আপন পুত্র নয়, ভ্রাতুষ্পুত্রকে—যে ভ্রাতাকে রাবণ দেখতে পারেন না, তাঁর পুত্রকে মায়া মমতা দেখালেন। বিভীষণ ও সরমার সন্তান তরণীসেন রামের হাতে মারা যাওয়ার পর বিভীষণ কেঁদে ফেলেছেন, সরমা শোকে ভেঙে গেছেন এবং রাবণ জ্যাঠাও কাঁদেন। কৃত্তিবাস বলেন :

ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণ গোচরে ॥
দূত কহে লঙ্কেশ্বর নিবেদি চরণে।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে ॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন।
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্রমিত্রগণ ॥
মৃত্তিকাতে বসে ভাবে লঙ্কা অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত সব বীর নারী ॥ (পৃ. ৪৩৬)

এই কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* থেকে নেয়া দৃষ্টান্তে যা পাই, তা পাই মাইকেলের কাব্যে- একজন সন্তানবৎসল রাক্ষস পিতা, রাবণ নামে।

মাইকেলের রাবণ যে ভাইদের সঙ্গে 'স্নেহবৎসল ভ্রাতা' তা আমরা কি করে জানতে পারি? *মেঘনাদবধ কাব্যে* তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের উল্লেখ আছে, একটি অলংকারে, তবে রাবণের সঙ্গে সম্পর্কটার বর্ণনা নেই। বিভীষণ আর রাবণের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বিভীষণ তাঁর ভাইয়ের বিপক্ষীয় দলের একজন। সরমা সীতার স্বপ্ন অশোকবনে শোনেন :

আছিল সে সভাতলে ধীর দর্মসম
বীর এক; কহিল সে পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে! সংসার মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কূবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।' - কহিল সরমা,
হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব? (৪:৫০৩-৫১১)

বিভীষণ ভাইয়ের সঙ্গে খুব একটা স্নেহের সম্পর্ক দেখানো হয় না, শুধু তা *মেঘনাদবধ কাব্যে* নয়, কৃত্তিবাসী *রামায়ণেও*। তবে মাইকেলের খণ্ড কাহিনীর শুরুর আগে রাবণের আরেক ভাইয়ের যুদ্ধে পতন ঘটেছিল। মাঝে মধ্যে রাবণ তাঁর মৃত ভাইয়ের কথা স্মরণ করেন।

কহিলা রাক্ষসপতি, কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ সিন্ধু তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে। (১:৭৫১-৭৫৫)

অথবা

... মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর। প্রাণ আমি ধরি কোন সাধে?
আর কি দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে?- (৯:৩৭-৪১)

এমন ইঙ্গিত থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে কুবের আর বিভীষণের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না থাকলেও রাবণ কুম্ভকর্ণের সঙ্গে সত্যিকারের স্নেহবৎসল ভ্রাতার মতো ব্যবহার করতেন *মেঘনাদবধ কাব্যে*। তবে স্নেহটা কত গভীর *মেঘনাদবধ কাব্য* নয়, কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* থেকেই জ্ঞাপন করা যায়।

কুম্ভকর্ণের পুরো ছয় মাস ঘুমনো উচিত ছিল। কিন্তু ভালো যোদ্ধা প্রয়োজন বলে অত সময় ঘুমোতে দেয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে কৃত্তিবাসের রাবণ তার ভাইকে যত্ন করে জাগাতে আজ্ঞা দেন।

পাঁচ মাস গত নিদ্রা একমাস আছে।
আজি লঙ্কা মজিলে সে কি করিবে পাছে।
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্ত্বে মোর যেন হয় সচেতন ॥ (পৃ. ৩৮০)

যখন তার জাগ্রত ভাইয়ের ওপরে প্রথমে চোখ পড়ে তখন যারপরনাই খুশি।

কুম্ভকর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ ॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী।
সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকুলি ॥

লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রামায়ণ অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্রে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা

কুম্ভকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ।
বসিতে দিলেন রাজ্য রত্ন সিংহাসন ॥ (পৃ. ৩৮৩)

কুম্ভকর্ণ মারা যাবার পর কৃত্তিবাস বলেন :

কুম্ভকর্ণ মৃত্যু কথা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন ॥
মুহূর্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া।
বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া।
তাই নহি আমি যে চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর ॥ (পৃ. ৩৯২-৩৯৩)

তারপরে এগারোটি ত্রিপদী চরণ দিয়ে দীর্ঘ বিলাপ, যেমন :

হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি ॥
ওরে প্রাণাধিক ভ্রাতা, মোরে ছাড়ি গেলে কোথা
দেখিতে না পাই আর তোরে।
ধিক ধিক প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর,
এখনো না ছাড়ে এ শরীরে ॥ (পৃ. ৩৯৩)

ইত্যাদি। আর শেষে কৃত্তিবাস বলেন :

এই রূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন ॥ (পৃ. ৩৯৪)

কৃত্তিবাসের রাক্ষস রাজ্য তাঁর একজন ভাইয়ের কাছে একজন রীতিমত 'স্নেহবৎসল ভ্রাতা' নিঃসন্দেহে। মাইকেলের রাবণও তাই।

এবার বোন সংক্রান্ত রাবণের ভ্রাতৃত্ব তিনি স্নেহবৎসল ভ্রাতা কিনা—পরীক্ষা করা হোক। তাঁর একমাত্র বোনের সঙ্গে খুব ভাব ছিল, যুদ্ধের সময়ও আছে, বোধহয়। তবে সোনার লঙ্কার শোচনীয় পরিস্থিতি অনেকটা ওই ভাবের প্রতিফলে। বেচারি অপমানিত শূর্পণখার আবদারে রাবণ সীতাকে হরণ করতে গিয়েছিলেন। পরে মাইকেলের রাবণ আপন মনে বলেন :

... হায়, শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী।
কাল পঞ্চবটীবনে কালকুটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? (১:৯৯-১০৪)

যদিও বোনকে দোষ দিচ্ছেন তবুও স্বীকার করতে হবে যে তিনি কোমল, সহিষ্ণু, স্নেহবৎসল ভাবে তিরস্কার করেন।

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* এত প্রকট ভাবাবেগ নেই বটে, তবে বোনের অনুরোধে তিনি সীতাকে হরণ করতে গিয়েছিলেন। বোনকে কি সন্তুষ্ট করার জন্যে, না নিজের লোভ মেটাবার জন্যে করেছেন, তা ঠিক জানা যায় না। মরে যাবার সময়ে কৃত্তিবাসের রাবণ রামকে কেবল বলেন :

আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
শূর্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কান ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হারে ॥
শূর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে ॥ (পৃ. ৫২৮)

মাইকেলের রচনায় রাবণের বোনের দুঃখের দরুন রাবণ দুঃখী এবং ওই দুঃখে সোনার লঙ্কায় সীতাকে আনেন। কৃত্তিবাস এক পয়ার দ্বিপদীতে বলেন যে, শূর্পণখা কান্নাকাটি করেন আর সঙ্গে সঙ্গে রাবণ সীতাকে হরণ করা স্থির করে ফেলেন। *মেঘনাদবধ কাব্যে* যে পরিস্ফুট ভ্রাতৃস্নেহের পুষ্প আমরা দেখতে পাই, সেটার বীজ কৃত্তিবাসের কাব্যে রয়েছে।

মাইকেলের রাবণ দোষী বা নির্দোষী হন-না কেন, তিনি কী অর্থে অনুরাগী স্বামী, সে-সম্বন্ধে একটু ভেবে নিতে হবে। প্রথম সর্গে তাঁকে তাঁর একজন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে আমরা দেখি। সেই দৃশ্যতে মহিষী চিত্রাঙ্গদা তাঁর স্বামীর সমুখে এসে মৃদু স্বরে কেঁদে-কেঁদে প্রশ্ন করে নালিশ জানান।

একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন? (১:৩৪৭-২৫২)

তদুত্তরে রাবণ বলেন :

এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরি? (১:৩৫৭-৩৫৮)

এবং

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি। (১:৩৬৭-৩৬৯)

তিনি স্ত্রীকে বলেন যে, শোকার্ত হওয়ার বদলে তাঁর গর্ব বোধ করা উচিত। এই সব উক্তি থেকে কি বলা যায়, রাবণ অনুরাগী স্বামী? চিত্রাঙ্গদা অন্তত রাবণের কথায় সান্ত্বনা পান না।

কে, কহ এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম ফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। (১:৪০৩-৪০৮)

তবে পাটরাণী মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণ সত্যি সত্যি অনুরাগ ও বিষণ্ণতা মেশানো একটা ভাব প্রকাশ করেন। মেঘনাদের মৃত্যুর পরে রাবণ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় মন্দোদরী ছুটে এসে তাঁর স্বামীর পায়ে পড়েন। তখন রাবণ :

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'বাম এবে, রক্ষঃ কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি।
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব।
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোহে স্মরিব তাহারে
অহরহ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি? (৭:৩৩৮-৩৪৮)

যদিও এখানেও স্ত্রীর চাইতে পুত্রের জন্য রাবণের আবেগ অনেক বেশি প্রবল—তা নাহলে তিনি কি বলতেন যে, শুধু পুত্রের মৃত্যুর প্রতিবিধিৎসার জন্যই বেঁচে আছেন—তবুও মন্দোদরীর প্রতি সত্যি একটা অনুরাগের অভিব্যক্তি অস্বীকার করা যায় না।

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার মধ্যে সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয় এবং বীরবাহুর মৃত্যুর পরে শুধু তাঁর পিতা রাবণ বিলাপ করেন। মাতা সেখানে অনুপস্থিত। মেঘনাদের হত্যার পর পিতা আর মাতা একসঙ্গে শোক প্রদর্শন করেন। যেখানে *মেঘনাদবধ কাব্যে* স্ত্রীর প্রতি করুণাময় রাবণ আন্তরিক হৃদয়তা দেখান, কৃত্তিবাসে সেই দৃশ্য নেই। তবে কৃত্তিবাসে রাবণ ও মন্দোদরী উভয়ে উপস্থিত এবং আক্ষেপ করেন। উপরন্তু রাবণের শোকের সঙ্গে রাগ এবং নিজে যুদ্ধে যাওয়ার উদ্যোগ মনস্থির করাটা আমরা দেখতে পাই কৃত্তিবাসে, যেমন আমরা পেয়েছি *মেঘনাদবদ কাব্যে*। কৃত্তিবাস বলেন,

কিছুদিন ছিল সুখ এখন ঘটিল দুখ
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে।

পুত্রশোক মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরী ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ॥

...

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিলে সোয়াস্তি নাই করয়ে শয়ন ৷৷
ইন্দ্রজিৎ শোক তবু নহে পাসরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ ৷৷
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে ঘর।
অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বর ৷৷

...

ধনুর্বাণ লয়ে রাবণ যায় মহাক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে।
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
রামের সীতা তারে দেহ থাক গৃহবাস ৷৷
মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়া না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ৷৷ (পৃ. ৪৬৪-৪৬৬)

কৃত্তিবাসের এই মন্দোদরীর বিলাপের বর্ণনা ভাগ করে মাইকেল *মেঘনাদবধ কাব্যের* চিত্রাঙ্গদার এবং মন্দোদরীর শোকের দৃশ্য দুটি সৃষ্টি করেন। দুজন স্ত্রী আকুল হয়ে কাছে ছুটে আসেন আর অবশেষে সখীদের সঙ্গে অন্তঃপুরে ফিরে যান। মাইকেল রাবণের উপরে ভর্ৎসনা মন্দোদরীকে দিয়ে না করিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে দিয়ে করান। এখানে মাইকেল মন্দোদরীকে কিছু বলতে দেন না। তবে উভয় কাব্যে মন্দোদরী অন্তঃপুরে প্রস্থান করার পর, রাবণ ক্রোধে অতিমানে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান। অনুরাগী স্বামী কি এমনভাবে অঙ্কিত হয়?

সুরেশচন্দ্র মৈত্র *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাক্ষসদের সুস্বভাব ও সদব্যবহার দেখিয়ে মন্তব্য করেন, খুব সম্ভব সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কম্ব'র দ্রাবিড়ী *রামায়ণ* থেকে নেয়া। তদুপরি তা যদি হয় মদুসূদন বৃহত্তর ভারতের শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যিকে মিলিয়ে তার প্রাদেশিক মূঢ়তা ভেঙ্গে দিয়েছেন। অবসান ঘটালেন বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের দৃষ্টি-সঙ্কীর্ণতার।[১১] যদিও মাইকেলের আর কৃত্তিবাসের রাবণ প্রায় একই চরিত্র, তবুও দ্রাবিড়ী প্রভাব তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকতেও পারে। *মেঘনাদবধ কাব্যের* মধ্য দিয়ে মাইকেল অন্য ক্ষেত্রে তাঁর প্রাদেশিক সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু দ্রাবিড় দেশে যাত্রা না করে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে গেলেন, যেখানে দুর্গাপূজার বদলে *রামলীলা* অনুষ্ঠিত হয়।

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* মেঘনাদের ন'হাজার স্ত্রী থাকলেও কোনো স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। প্রমীলা নামটি বলাবাহুল্য কাশীদাসী *মহাভারত* থেকে তোলা। প্রমীলার গুণচয়ের নানান উৎস হতে পারে ভার্জিলের ক্যামিল, টাসোর ক্লরিন্ডা অথবা স্বয়ং কাশীদাসের প্রমীলা[১২] বা যে কোনো বাঙালি স্ত্রী এবং মাইকেলের আপন কল্পনা-শক্তি সব মিলিয়ে। তবে যে মেঘনাদের একজন প্রধান স্ত্রী নামসুদ্ধ আছেন, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সেই স্ত্রী সতী হন, খুব সম্ভব *মেঘনাদবধ কাব্যে* সেই দুটি উপাদান রামলীলা থেকে আসে। অন্তত সেইক্ষেত্রে হিন্দী ভাষী *রামলীলার* সঙ্গে মিল দেখা যায়।

বাংলার শারদীয়া দুর্গাপূজা নিয়ে অঙ্কিত চিত্র

দুর্গাপূজার সময় এ ধরনের রামলীলার অভিনয় হয়

যেই সময় বাংলাদেশে শারদীয়া দুর্গাপূজা হয়, সেই সময় অন্যত্র একাধিক দিনব্যাপী বাৎসরিক *রামলীলা* আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী অবধি অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়া দশমীতে রাবণবধ ঘটে তবে তাঁর স্ত্রীকে—প্রমীলা নয়, সুলোচনা নামে চিতায় সতী হতে দেখানো হয়। মাইকেল কখনো *রামলীলা* দেখেছিলেন কিনা সঠিক বলা যায় না। গৌরদাস বসাক তাঁর একটা স্মৃতিকথার পাদটীকায় *রামলীলার* উল্লেখ করেন। The Hindustani Ram Jatra and Ram Lila are performed with great eelat mostly by professional people.[১৩] গৌরদাস যখন *রামলীলা* সম্বন্ধে জানতেন, তখন মাইকেলের জানবার কথা। যাই হোক, প্রমীলার সতীদাহ—হয় *রামলীলার* প্রভাবে এসেছে, না হয় কবি স্বতন্ত্রভাবে বানিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* সে দৃশ্য দেখানো হয় না।

অন্য ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে হোক বা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে হোক, যতই অভিনব উপাদান থাকুক না কেন এবং সাহিত্য-সমালোচক *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাবণের সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র সম্বন্ধে যাই বলুন, সেই রাক্ষসরাজা সীতাকে হরণ করেছেন, যেখানে তিনি করেছিলেন কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*। কৃত্তিবাসের কাব্যে দুটো জায়গায় সীতার সঙ্গে রাবণের দেখা সাক্ষাৎ হয়, প্রথমে পঞ্চবটী বনে যখন আসল হরণ পর্বটি ঘটে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে লঙ্কার অশোকবনে যখন সীতা বন্দী।

মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা মাত্র প্রথম পরিস্থিতিতে সীতার সঙ্গে রাবণের ব্যবহার দেখার সুযোগ পাই। অন্যটি মাইকেল তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেন না। সেখানে, মানে অশোকবনে, রাবণ কিভাবে ব্যবহার করতেন, তা বলা যায় না। তবে হরণ করার সময় রাবণের যে চরিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়, *মেঘনাদবধ কাব্যে* তা থেকে লেশমাত্র

পার্থক্য নেই। মাইকেলের কাব্যে সীতা সরমার সঙ্গে কথা বলার সময় ওই আগের ঘটনার বিবরণ জানা যায়। সরমা জিজ্ঞেস করেন :

... নিষ্ঠুর হায় দুষ্ট লঙ্কাপতি।
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমন হরিল
ও বরাঙ্গ অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?' (৪:৮০-৮২)

কৈফিয়তে সীতা বলেন :

বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি।
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়ায়নু পথে সে সকলে
চিহ্ন-সেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে! (৪:৯৩-৯৮)

কৃত্তিবাসও একই কৈফিয়ৎ দেন :

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগন ॥
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী ॥
ছিড়িয়া ফেলেন মণি মুকুতার ঝারা।
হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥ (পৃ. ১৮৭)

মাইকেলের হাতে যে সরমার অভিযোগে রাবণ ক্ষমা পেয়েছেন তা নয়। এই অপরাধের জন্য সীতার আভরণ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিনি কৃত্তিবাসী *রামায়ণেই* দোষী ছিলেন না।

মেঘনাদবধ কাব্যে হরণ করাটার বর্ণনা করতে গিয়ে সীতা সরমার কাছে রাবণের কথা বলছেন :

ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত অরি-
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,

ভিক্ষা দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি; (৪:৩৩৭-৩৪৮)
...
দূরে গেল জটাজুট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা।
চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্তনাদ, প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নুপুর, কাঞ্চী, ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।' (৪:৩৬৭-৩৮৩)

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* ঘটনা প্রায় একইভাবে ঘটেছে। কৃত্তিবাস বলেন :

এত ক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ।
ভিক্ষা ঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি ॥
...
রাবণ আমার নাম জানে মুনি গণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে ॥
...
ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন ॥
...
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনে প্রভুর ঘরের বাহির নহি।
রাবণ বলিল ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর ॥
জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম কর্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে ॥

সীতাহরণ মুহূর্তে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে এসে রাবণ এভাবেই সীতার হাত চেপে ধরেছিল

...
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন হায় একি বিপরীত ॥
দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ ॥
রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন।
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন ॥
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন ॥
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন ॥
তপস্বীর বেশ ধরি আমি তপোবন।
অনুগ্রহ করে মোরে আমি দাস জন ॥ (পৃ. ১৮৩-১৮৪)

তারপর সীতার ভর্ৎসনায়, রাবণ ক্রুদ্ধ হন। কৃত্তিবাস বলেন :

করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি ॥
প্রকাশে রাক্ষস মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ। (পৃ. ১৮৫)

কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* রাবণ যতই সীতার উপরে অত্যাচার করেন, তার চেয়ে তিনি কম করেন না *মেঘনাদবধ কাব্যে*।

রাম (-লক্ষ্মণ) সম্বন্ধে কেউ না কেউ মনে করেন যে মাইকেল ওই (দুটি) চরিত্র ছোটো করে বানিয়েছেন। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*র সঙ্গে আবার তুলনা করলে তা প্রমাণ করা দুষ্কর। বাল্মীকির মহাকাব্যে রাম-রাবণের চরিত্র যেমন ছিল, মোটামুটি তেমনি করে চিত্রিত হয়

দশমুণ্ডু রাবণের কল্পিত মূর্তি

মেঘনাদবদ কাব্যে। (অবশ্যই মাইকেলের রাক্ষসরা অপমান করে 'ভিখিরী' বলে রামকে ডাকেন। আর রামও নিরাশায় দুঃখ প্রকাশ করে নিজেকে 'ভিখারী' বলে অভিহিত করে ডাকেন। তবে শুধু বললে তো হয় না।) স্বীকার করতে হবে কৃত্তিবাস মধ্যযুগীয় ভক্তিবশত যেমন–মানবোচিত রাজকুমার রামকে একেবারে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে এঁকেছেন, মাইকেল সেই রকম করেননি। *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাম মূলত বাল্মীকির আদি রামের মত শুধু মানুষ দেবতা নন।

মানুষ তো বটেই তবে বীরপুরুষ মহৎ মানুষ কিনা অনেকে সন্দেহ করেন। প্রমথনাথ বিশী মৃদুভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বোঝালেন। রাবণকে তিনি এত প্রকাণ্ড করিয়া গড়িয়াছিলেন যে তার চেয়ে বড়ো করা সম্ভব ছিল না–তাই তুলনায় রাম ও লক্ষ্মণ ছোটো হইয়া গেল।'[১৪] মোবাশ্বের আলী সোজাসুজি লেখেন : 'রামের ভীরুতা ও কাপুরুষতা সর্বজনস্বীকৃত।'[১৫]

রামের কাপুরুষতা বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* প্রতীয়মান। যেভাবে তিনি লুকিয়ে সুগ্রীবের ভাই বালিকে মেরেছেন, সেটাকে কাপুরুষতা বলে মেনে নিতে বাধ্য। *মেঘনাদবধ কাব্যের* অষ্টম সর্গে যখন রাম প্রেতদেশের সঞ্জীবনীপুরী ভ্রমণ করছেন তখন মাইকেল সেই ঘটনা বালিকে উল্লেখ করে বলতে দেন। তবে মাইকেলের রচনায় সঙ্গে সঙ্গে রামকে ক্ষমা করা হয়। বালি বলেন :

> ... কি হেতু হেথা সশরীরে আজ্ঞি,
> রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
> সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
> কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে
> নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে। (৮:৬১২-৬১৬)

অন্যত্র লক্ষ্মণের মেঘনাদ হত্যায় যাবার প্রাক্কালের দৃশ্যর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোবাশ্বের আলী লেখেন : 'লক্ষ্মণ মেঘনাদবধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রামের নিকট অনুমতি লাভের জন্য এসেছে। তখন সে ভীরু রমণীর ন্যায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ যতই তাকে দৈবীশক্তির আশ্বাস দিক না কেন, কিছুতেই তার ভয় ঘুচে না। প্রাণাধিক প্রিয় ভাই লক্ষ্মণকে এই সর্পবিবরে পাঠাতে কিছুতেই তার মন চায় না।'[১৬] মাইকেল সত্যি এইভাবে বলেছেন, যেমন :

> কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
> প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।' (৬:৫১-৫২)

কৃত্তিবাসের রাম তো কম সংকোচ বোধ করেননি। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* বিভীষণ অনুরোধ করে বলেন :

> লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
> যজ্ঞভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিৎ ॥ (পৃ. ৪৫৬)

আর :

> শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
> কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ ॥
> একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
> তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর ॥
> বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
> মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর ॥
> কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে।
> কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ সনে ॥
> বিভীষণ বলে গোঁসাই ভাব কি কারণ।
> শত ইন্দ্রজিৎ বল ধরেন লক্ষ্মণ ॥ (পৃ. ৪৫৭)

বেশ কিছু বলাবলির পরে রাম অনুমতি দেন। কৃত্তিবাস বলেন :

> গড় মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
> বিভীষণ হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে ॥ (পৃ. ৪৫৭)

কৃত্তিবাসের রাম যে সব সময় ভয়হীন, তা মোটেই নয়।

আরেক আবেগপূর্ণ দৃশ্যও সফলভাবে তুলনা করা যাবে। যখন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হয়ে মড়ার মতো শুয়ে আছেন তখন রাম শোকে ভেঙে পড়েন, 'রমণীর ন্যায়' বলতে পারা যায়। মাইকেল এই নাটকীয় মুহূর্তে রামের মুখে বিলাপ ভাষণ বসিয়ে দেন, দীর্ঘ আটান্নটি পয়ার চরণ দিয়ে। তা থেকে উদ্ধৃত করি :

> রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
> লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
> ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত

রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি, ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্যে সর্বভুক্‌সম
দুর্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
'কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে
ধনুর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?" কি বলে বুঝাব
ঊর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?

উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ রে পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি,
পুজিনু দেবতাকুলে,—'দিলা কি দেবতা
এই ফল, হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে। (৮:১৯-৭৭)

এখানে যদি রাম একটু বেশি ভাব আক্রান্ত হন, তবে মাইকেল পুরোপুরি দায়ী বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না। এত সুন্দরভাবে রচিত না হলেও একই দৃশ্য প্রায় একই রকমে কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* বিদ্যমান। কৃত্তিবাস বলেন :

রণ তিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী ॥
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥
হারালাম প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন ॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন।
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চরের নিধি।
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন হে নিষ্ঠুর হ'লে না দেহ উত্তর ॥
সবাই সুধাবে বার্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥

যুদ্ধাহত লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে রামচন্দ্রের কান্না

রাজ্যধনে কার্য নাই নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে ॥
উদয়াস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ॥
উঠ রে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস।
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান ॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্যে দিনু ডালি।
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি ॥
কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন ॥
কার্তবীর্যাজুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর ॥
এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্রদণ্ড।
কৈকেয়ী সত্যই তাহে হইল পাষণ্ড ॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।

বিধি বাদী হৈল এই তাহে সর্বনাশ।
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ রাম পাইবে লক্ষ্মণ ॥
ভাই ভাই ব'লে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরামের বিলাপ রচিল কৃত্তিবাস ॥ (পৃ. ৪৭০-৪৭১)

উভয় করিব লেখা থেকে উদ্ধৃতিতে সীতার কথা উঠেছে। দুটোতে রাম আবেগবশত বলেন যে, স্ত্রীকে উদ্ধার করা যাবে না। শুধু তা নয়, স্ত্রীকে না পাওয়াটা তাঁকে মেনে নিতে হবে অথবা তাঁর মেনে নেয়া উচিত ছিল। এমন মনোভাব একাধিকবার উচ্চারিত হয়, *মেঘনাদবধ কাব্যে* এবং কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*। যেমন—ধরুন, কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* যখন বিভীষণের ছেলে তরণীসেন বিষ্ণুর অবতার রামকে স্তুতি করতে করতে মারা যায় তখন লঙ্কার যুদ্ধ সম্বন্ধে রামের অসন্তুষ্টি জাগে।

কৃত্তিবাস বলেন :

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনু এখন।
কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর।
এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর ॥
রাম বলে বিভীষণ বলি হে তোমারে।
কেমন ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে।
অকারণে করিলাম সাগর বন্ধন।
ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন ॥
যত যুদ্ধ করিলাম শ্রম হৈল সার।
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ॥
কার্য নাই সীতা আমি না যাব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাপ ভক্তের অঙ্গেতে ॥ (পৃ. ৪৩৪)

পরে রাম যখন দেবীর পূজা করছেন এবং প্রয়োজনীয় অর্ঘ্য পাচ্ছেন না তখন ক্ষণস্থায়ী ভাবে তিনি হতাশ হয়ে যান। কৃত্তিবাস বলেন :

শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর।
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হবে উদ্ধার ॥
যাহ মিতা সুগ্রীব স্বগণে ল'য়ে যাও।
মিছে আর কেন কাঁদ মিছে মুখ চাও।
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যা ভুবনে।
রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে ॥
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র ভিতর।
এত বলি কান্দে রাম সশোক অন্তর। (পৃ. ৫১৯)

রামের এই প্রবণতা-ভীরুতা, কাপুরুষতা বা কেবল নিরাশা, যাই বলি না কেন—সেটা মাইকেলের হাতে সৃষ্টি হয়নি, কৃত্তিবাসের রামের স্বভাবের মধ্যে ছিল।

লক্ষ্মণের আচরণে একটি- তবে অনেকের ধারণায় ক্ষমাহীন একটি ত্রুটি *মেঘনাদবধ কাব্যে* দেখানো হয়। তিনি অস্ত্রহীন মেঘনাদকে যুদ্ধের জন্য সাজতে না দিয়ে মেরেছেন। একেবারে গোড়ার দিক থেকে এই ত্রুটির অভিযোগ মাইকেলের কাছে জানানো হয়েছে। রাজনারায়ণ বসুকে পাঠানো চিঠিতে মাইকেল লেখেন : 'I have not yet heard a single line in Maghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry poor Lakshman is represented as killing Indrajit in cold blood and when unarmed.!'[১৭]

ইন্দ্র কর্তৃক রামচন্দ্রের দেব বা ব্রহ্ম অস্ত্র প্রাপ্তি

লক্ষ্মণ আসলে কি করলেন? চণ্ডীদেবীর কাছ থেকে তিনি পরামর্শ, মায়াজাল—যাতে তিনি ও বিভীষণ রাক্ষসদের কাছে অদৃশ্য থাকতে পারেন—এবং দৈব অস্ত্র পেয়েছেন। আরেকটি দৈব-অস্ত্র তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত, যেটি ইন্দ্র দ্বিতীয় সর্গে রামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারপর যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ আর বিভীষণ অগ্রসর হন। লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে ঢুকলে মেঘনাদ প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেননি। পরে লক্ষ্মণকে চিনতে পেরে তিনি যুদ্ধের জন্য সাজতে চান। মাইকেলের মেঘনাদ বলেন :

— সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তবে, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে; কি আর কহিব? (৬:৪৭৫-৪৮৩)

লক্ষ্মণ তাকে যেতে দেন না। মনে রাখতে হবে, কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* মেঘনাদ তিনবার রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই হচ্ছে তৃতীয়বার। প্রথম দুবার রাম এবং লক্ষ্মণ, দুজন মিলে মেঘনাদের হাতে পরাজিত হন। এইবার *মেঘনাদবধ কাব্যে* লক্ষ্মণ যখন তাঁকে অস্ত্র যোগাড় করার জন্য বাইরে যেতে দেন না তখন মেঘনাদ ভদ্রতা বজায় না রেখে গালাগালি দিতে লাগলেন। 'ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে/লক্ষ্মণ। নির্লজ্জ তুই। .../ পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি?' (৬:৪৯২-৫০০) এই বলতেই মেঘনাদ আক্রমণ করেন।

চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! (৬:৫০১-৫০৭)

মেঘনাদ লক্ষ্মণের অস্ত্র তুলতে গিয়ে পারেন না। তারপর তার খুল্লতাত বিভীষণকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কাকার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলার পর তিনি আজ্ঞা দেন :

... ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে। (৬:৫২৮-৫৩০)

বিভীষণ দরজা ছাড়েন না। তার পরে বিভীষণ আর মেঘনাদের মধ্যে কথোপকথন হয়। ততক্ষণ লক্ষ্মণ অজ্ঞান ছিলেন। তারপর :

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, ...
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
...
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম সঞ্চালনে।

এবং শেষে :

ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে

নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। (৬:৫৯১-৬২৪)

তারপরে আস্তে আস্তে মেঘনাদ মরে যান।

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* মেঘনাদ কিভাবে মারা যান? মায়া-চণ্ডীদেবীর স্থানে বিভীষণ নিজেই মেঘনাদকে হত্যার উপায় রাম-লক্ষ্মণের কাছে বুঝিয়ে দেন। মেঘনাদকে তাঁর নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ অবধি করতে না দেওয়া হলে সেদিন তিনি পরাজিত হয়ে মরবেনই মরবেন। ব্রহ্মা আগে সেইরকম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই আশ্বাসজনক সুসংবাদ পেলেও কৃত্তিবাসের রাম লক্ষ্মণকে পাঠাতে ইতস্তত করেন। বিভীষণ তখন রামকে ভরসা দিয়ে বলেন যে তাঁরা দুজনে একা যাবেন না, হনুমানরাও যাবে। আসলে বীর লক্ষ্মণের বদলে হনুমান প্রথমে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে মেঘনাদের সামনে দাঁড়ায় ও যজ্ঞ থামিয়ে দেয়। কৃত্তিবাস বলেন :

ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড পাড়ে ॥
সম্মুখে দণ্ডায় বীর পরম সন্ধানী।
বৃক্ষাঘাতে নিভায়ে সে যজ্ঞের আগুনি ॥
হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তার করলি প্রস্রাব ॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফল ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।
যজ্ঞ দ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে ॥ (পৃ. ৪৫৭)

মেঘনাদ সাজলেও বীর লক্ষ্মণ নয়, হনুমান তাঁকে পুরোপুরি তৈরি হতে দেয় না। সাজুক বা না-সাজুক ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী মেঘনাদের মৃত্যু সেই দিনই অনিবার্য। তা জেনেও যুদ্ধ করতে করতে কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণ একবার ভয় পেয়ে যান।

মেঘনাদ মায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ।
হেন কালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ ॥
বিভীষণ বলে তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ ॥ (পৃ. ৪৫৯)

যুদ্ধের মধ্যে কৃত্তিবাসের মেঘনাদ একবার লঙ্কা পুরীর মাঝখানে রাক্ষসদের কাছে পালাতে চান। যেমন—*মেঘনাদবধ কাব্যে* যখন অস্ত্রাগারে ঢোকার ইচ্ছে করেন তেমনি এখানে কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* বিভীষণ কাকা তাঁকে যেতে দেন না। কৃত্তিবাস বলেন :

ইন্দ্রজিৎ পলাইয়া লঙ্কা যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে ॥
বিভীষণ বলে বাছা আজি যাবে কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা ॥

শীঘ্র এস লক্ষ্মণ ডাকেন বিভীষণ।
ত্বরা করি দুষ্ট বেটার বধহ জীবন ॥
বিভীষণ বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিৎ কাছে গেল পুরিয়া সন্ধান ॥ (পৃ. ৪৬০)

যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণের বাইরে থেকে একটু সাহায্যও দরকার হয়। মাইকেলের লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে যাবার আগে তাঁর সব কটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র পেয়ে গিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণ যুদ্ধের মধ্যে একটা পান।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞরত ইন্দ্রজিত মেঘনাদ

ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ যখন লক্ষ্মণের সাথে সম্মুখ সমরে

লক্ষ্মণ অশক্ত হৈল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপায় ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম অস্ত্র পুরিল সন্ধান ॥ (পৃ. ৪৬০)

আর কয়েক চরণ পরে লক্ষ্মণ ওই সদ্যপ্রাপ্ত দৈব অস্ত্র দিয়ে মেঘনাদের মুণ্ড কেটে ফেলেন, মাইকেলের লক্ষ্মণও দেব অস্ত্র ব্যবহার করেন। যেমন— কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*, তেমনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে' দৈব সাহায্য ছাড়া লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করতে পারতেন না।

মাইকেল মেঘনাদের মুখে নানান কথা বসিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* যা লক্ষ্মণ করেন, প্রায় তাই করা হয় *মেঘনাদবধ কাব্যে*। অবশ্যই কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* যেখানে অসংখ্য হনুমান সৈন্যের সাহায্যে বীর লক্ষ্মণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারতে যান, সেখানে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ একলা গমন করেন। তা কোন কাব্যে বীরত্ব বেশি? অধিকন্তু কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণ ও মাইকেলের রামানুজকে পাশাপাশি রাকলে কোনো মূলগত পরিবর্তন কি দেখা যায়?

চরিত্রের রূপান্তর ছাড়া মেঘনাদবধ কাব্যে নিয়তি বা ফেট এর কথা আর পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত ট্রাজেডি সম্বন্ধে কথা উঠেছে। আবু হেনা মোস্তাফা কামাল একটা প্রবন্ধে *তিলোত্তমা সম্ভব* ও *মেঘনাদবধ কাব্য* চমৎকারভাবে তুলনা করেন। সেই প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি ট্রাজেডির কথা তোলেন।

"তিলোত্তমা সম্ভবে' নিয়তি বা বিধির পরিকল্পনা গ্রীক নেমেসিসের ওপরে বিন্যস্ত হলেও মধুসূদন তাতে পাশ্চাত্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। সেই আরব্ধ দায়িত্ব তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে' পালন করেছেন। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী বীর পুত্রের জনক, প্রজারঞ্জক রাজা রাবণ যে নিয়তির দ্বারা তাড়িত ও লাঞ্ছিত তার উৎস গ্রীক ট্রাজেডি। রামায়ণ ও মহাভারতে যথাক্রমে রাম লক্ষ্মণ ও যুধিষ্ঠিরাদির দুঃখভোগের কাহিনী আছে বটে, তবে তাঁরা কেউ নিঃসঙ্গ ছিলেন না ভাগ্যফলকে মেনে নিয়েও তাঁরা দৈব অনুগ্রহ ভোগ করেছেন। কিন্তু রাবণ যেন রাজা ইডিপাসের মতোই নির্বান্ধব—নাটকের জটিলতম অঙ্কে তিনি একা—সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, কেউ তাঁর অবলম্বন নয় এবং সহোদর বিভীষণ থেকে আরাধ্য মহাদেব পর্যন্ত সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে।"[১৮]

রাম-লক্ষ্মণ যুধিষ্ঠিরের চাইতে বোধহয় মাইকেলের রাবণ নাটকের জটিলতম অঙ্কে নিঃসঙ্গ। হতে পারে তিনি ঠিক *ইডিপাসের* মতো নির্বান্ধব। তবে, মাইকেলের রাবণ কৃত্তিবাসের রাবণের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে—নির্বান্ধব নিঃসঙ্গতা সংক্রান্ত যেমন কৃত্তিবাসের রাবণ তেমনি মাইকেলের রাবণ। উভয় কাব্যে রাবণের পুত্রগণ তাঁর ভীষণ পক্ষপাতী। উভয় কাব্যে তারা পিতাকে ত্যাগ করে পরলোকে চলে যায়। উভয় কাব্যে সহোদর বিভীষণ তাঁর মুখাপেক্ষী। উভয় কাব্যে আরাধ্য শিব-শক্তি শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে।

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* মেঘনাদের মৃত্যুর পর এবং রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার আগে রাবণ দেবীকে পূজা করে অভয় দান পান। তবে তার পরেই রাম পূজা করে দেবীর সহায়তা লাভ করেন- অগত্যা রাবণকে ছেড়ে রামকে দেবী তার দয়া আরোপ করেন। *মেঘনাদবধ কাব্যে* দেবীর উপরোধে তাঁর স্বামী মহাদেব রাবণকে ছেড়ে রামের পক্ষে সরে আসেন। কৃত্তিবাসের রাবণ-এমন কি বাল্মীকির রাবণ একা, নিঃসঙ্গ, *ইডিপাসের* মতো নির্বান্ধব বলে আমরা কি বলতে পারি যে কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি পাশ্চাত্য ট্রাজেডিতে খুব প্রভাবিত?

মাইকেল স্বয়ং যদি বা প্রভাবিত হন, তবে তার ফলে যে সাহিত্যের ফুল ফুটালেন সেটি কি একদম অবঙ্গীয় বা অভারতীয়? প্রমথ চৌধুরী বোধহয় তাই মনে করলেন : "ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও, তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে, হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' পরগাছার ফুল। অর্কিড এর মত তার আকারের অপূর্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও তার সৌরভ নেই।"[১৯]

মাইকেলের কাব্যে নতুনত্ব, নতুন পদার্থ, নতুন আমেজ আছে বলে অস্বীকার করা যায় না। সুশিক্ষিত, বহুভাষাবিদ, উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বারা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনেক কিছু আমদানি করা হয়েছে তাও সত্য এবং স্বীকৃত। তবে, কী আর কী ভাবে করা হয়েছে তা এখনো, আমার মনে হয়, আলোচ্য বিষয়।

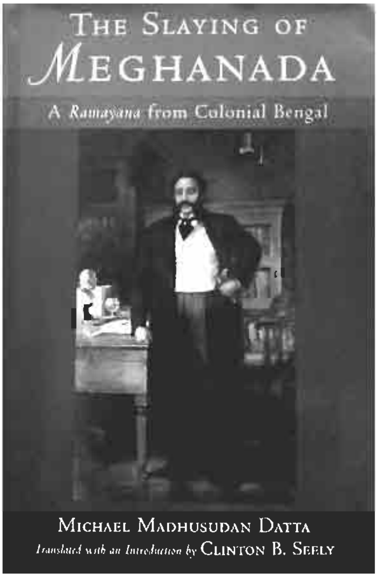

ক্লিন্টন বি. সীলি অনূদিত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রচ্ছদ

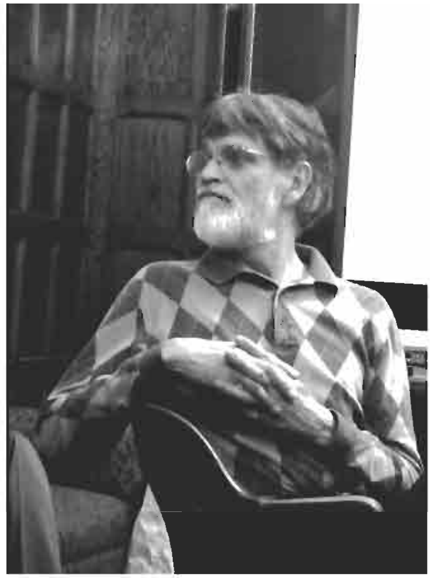

প্রাবন্ধিক-অনুবাদক ও সাহিত্য বিশ্লেষক ক্লিন্টন বি. সীলি

মধুসূদন যে আধুনিক বাংলার কবিতার প্রজাপতি তা আজকাল সর্বজনস্বীকৃত। *মেঘনাদবধ কাব্য* প্রকাশের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের গর্ব। তবে, কেউ কেউ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ, *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর নিন্দাও করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে মাইকেলের তথাকথিত 'এপিক' তো এপিকই নয়। 'হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নামমাত্র মহাকাব্য শ্রেণিতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।' এবং রামাদি চরিত্রের সম্বন্ধে সেই প্রবন্ধে লেখেন : 'গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংশ ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমারকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোনখানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি *মেঘনাদবধ কাব্যে* ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই সেখানে কী আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে। *মেঘনাদবধ কাব্যের* পাত্রগণের চরিত্রে অনন্য সাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। *মেঘনাদবধ কাব্যের* কোনো পাত্র আমাদের সুখদুঃখের সহচর হইতে পারন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক হইতে পারেন না। কখনো কোনো অবস্থায় *মেঘনাদবধ কাব্যের* পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। সেই সকল অমর সহচর সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দিকব্যাপী সেই কবিত্ব জগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন লেখাটাকে মহাকাব্য বল?'[২০]

মাইকেলের ইন্দ্রজিতে অমরতা নেই তা হয়তো আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় ভুল। বাঙালি হিন্দু সমাজে ইন্দ্রজিৎ তো অমর, জীবিত আছেন। বাল্মীকির বা কৃত্তিবাসের রাক্ষসাত্মা ইন্দ্রজিৎ নয় কিন্তু। আধুনিক সমাজে মধুসূদনের বীরাত্মা ইন্দ্রজিৎ জীবনময় সহচর হিসেবে রয়েছেন। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নাম সবার জানা আছে। নাট্যকার বাদল সরকারের ইন্দ্রজিৎও আমাদের মনের জগতে বেঁচে আছে। তাছাড়া, সত্যি একজন জ্যান্ত জীবন্ত জীবিত পুরুষ মানুষকে ইন্দ্রজিৎ নামে আমি এবং অনেকে নিঃসন্দেহে চেনেন। মাইকেলের কাব্যের আবির্ভাবের আগে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ নামক কোনো ব্যক্তি ছিল কি বঙ্গদেশে?

তথ্যনির্দেশ

১. ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*, (কলকাতা : গ্রন্থ নিলয়, ১৩৭০), পৃ. ১৫৩।

২. ঐ, পৃ. ১৪৬।

৩. সুরেশচন্দ্র মৈত্র-দ্বারা উদ্ধৃত, মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা : পুথিপত্র, ১৯৭৫), পৃ. ১৮৭।

৪. ঐ পৃ. ১৮৮।

৫. মোহিতলাল মজুমদার, *কবি মধুসূদন*, (কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৩য় সং, ১৯৭৫), পৃ. ৪৪-৪৫।

৬. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলার কবি মধুসূদন*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ৩য় সং, ১৯৭৮), পৃ. ৫৬।

৭. মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ১৯২।

৮. মোবাশ্বের আলী, *মধুসূদন ও নবজাগৃতি*, (ঢাকা : মুক্তধারা, ৩য় সং, ১৯৮১), পৃ. ৯১।

৯. মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ১৯৭।

আর এক দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে, জৈনদের কন্নড় ভাষায় লিখিত *রামায়ণে* রাবণের মনুষ্যত্ব আর বীরত্ব বেশ প্রত্যক্ষভাবে অঙ্কিত হয়। (দ্র : এ. কে. রামানুজন, "300 Ramayanas : 5 Examples and 3 Thoughts," South Asia Workshop on Text and Interpretation, the Umversity of Chicago, February 6, 1987)। তবে মধুসূদনের যে কম্বর জৈনদের *রামায়ণের* সঙ্গে পরিচয় ছিল কিনা তা আমরা জানি না। তাঁর চিঠিপত্রে যেখানে ব্যাস, বিশ্বনাথ, কালিদাস, বাল্মীকি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় সেখানে কম্বর উল্লেখ নেই, জৈন রামায়ণও অনুপস্থিত। *মেঘনাদবধ কাব্যের* চতুর্থ সর্গে যেখানে বাল্মীকি ভর্তৃহরি, ভবভূতি, কালিদাস, মুরালি ও কৃত্তিবাসের নামের সামনে তিনি প্রণাম করেন, সেখানেও কম্ব নেই।

১০. নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ*, (এলাহাবাদ : ইন্ডিয়ান প্রেস পাবলিকেশন্স; কলিকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩৩৯). পৃ. ৪৫০। এরপর থেকে পৃষ্ঠা প্রবন্ধেই উল্লিখিত হবে।

১১. মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ১৯৭।

১২. প্রমীলা চরিত্রের উৎপত্তি কথার জন্য দ্রষ্টব্য : যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত*, (কলিকাতা : চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লি., ৫ম সং, ১৯২৫), পৃ. ৩৬২-৬৭।

১৩. ঐ, পৃ. ৬৫২।

১৪. প্রমথনাথ বিশী, *বাংলা সাহিত্যের নরনারী*। (কলকাতা : মৈত্রী, ১৩৬০), পৃ. ২৫।

১৫. মোবাশ্বের আলী, *মধুসূদন ও নবজাগৃতি*, পৃ. ২১৬।

১৬. ঐ. পৃ. ১১৩। আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে মাইকেল 'রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু', বানিয়ে দিয়েছিলেন। ("মেঘনাদবধ কাব্য", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুত, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৯, পৃ. ৮০)।

১৭. গুপ্ত, *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*, পৃ. ১৫৭।

১৮. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, *শিল্পীর রূপান্তর*, (ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৫), পৃ. ৭১-৭২)

১৯. প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজপত্রের মুখপত্র', *নানা কথায়* অন্তর্ভুত, (কলকাতা : লেখককৃত, (১৯১৯), পৃ. ১০৯-১০।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেঘনাদবধ কাব্য", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অচলিত সংগ্রহ, পৃ. ৭৮, ৭৯। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে (১২৮৯) এটি ছাপান যখন তাঁর বয়েস মাত্র একুশ। পাঁচ বছর আগে তাঁর দ্বারা 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা থেকে ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সুদীর্ঘ সমালোচনায় মধুসূদনের কবি-মহিমাকে প্রায় ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলো। (অমিতাভ গুপ্ত, কবি মধুসূদন দত্ত এবং ছিন্নমূল আমরা", 'গাঙ্গেয় পত্র', ফাল্গুন, ১৩৮৩, পৃ. ৫১)। পরে মেনে নেন : 'ইতিপূর্বেই আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস-কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায়অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।' ('জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃ. ৩৫৪)। আরো পরে ছেষট্টি বছর বয়েসে যখন সাহিত্যের গুরুদেব হয়ে বিচিত্রা ভবনে সাহিত্যে নতুনত্বের বিষয়ে স্বল্পবয়েসী 'কল্লোল' এবং প্রতি 'কল্লোল'দের বুঝিয়ে টুঝিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন মধুসূদনের কথা তুললেন 'আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে। তার পরে, প্রমথ চৌধুরীর ন্যায়, তিনি লেখেন : 'এ কথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে *মেঘনাদবধ কাব্য* তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষার স্বভাবকে মেলে চলেননি। তাই তিনি যে ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না।' ('সাহিত্যের পথে', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে অন্তর্ভুত, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৫, পৃ. ৪৯৩, ৪৯৪) কৃতি স্বীকার করলেও তা থেকে বলা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের পক্ষপাতী পুরোপুরি হয়েছিলেন কখনো।

"মাইকেলের হাতে রামাদি চরিত্র" শিরোনামে প্রবন্ধটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর জার্নাল অব কম্পারেটিভ লিটারেচার, ২৯ : ১৯৯০-৯১ সংখ্যায় *প্রকাশিত। প্রাবন্ধিকের অনুমোদনক্রমে চিত্রসহযোগে নবরূপে এবং নতুন শিরোনামে ভাবনগরে মুদ্রিত হলো। প্রবন্ধের মধ্যে ব্যবহৃত ছবিসমূহ সম্পাদকের নির্বাচিত, বিভিন্ন গ্রন্থ ও ইন্টারনেট হতে গৃহীত। উল্লেখ্য, প্রবন্ধের শুরুতে নতুন একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে।*